ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৪র্থ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৪২২

নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা*: একটি উত্তর-ঔপনিবেশিক আলোচনা

মোঃ মেহেদী হাসান*

সন্দীপনকালের (enlightenment, সপ্তদশ শতক) প্রধান তিন মন্ত্র ছিলোঃ যন্ত্রবিজ্ঞানে দীক্ষা, ভৌগোলিক অভিযাত্রা, মানবসম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক প্রয়োজনের গুরুত্ব। এ তিন মন্ত্র পাঠ করে ইউরোপের মৌমাছিরা মধু সংগ্রহের আশায় বেরিয়ে পড়েছিলো সারা বিশ্বে।[১] সভ্যতার এক নতুন ইতিহাস রচিত হলো তাদের হাতে। তারা হলো আমরা (বি); তাদের হাতে আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা আর প্রাচ্য হয়ে উঠলো অপর (other)।[২] ইউরোপের মৌমাছিদের আমরা সভ্যতা (we civilization) অপর সভ্যতাকে সভ্য (!) করার জন্যে সে সময় যা কিছু নিয়ে এসেছিলো সেগুলোর মধ্যে ধর্মও ছিলো। বলাবাহুল্য এ ধর্ম মানবধর্ম নয়, ইউরোপীয়দের খ্রিশ্চিয়ানিটি, যদিও সন্দিপনকালের (enlightenment) অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিলো ধর্ম বিশ্বাসে অনাস্থা (mistrust of religion)। অবশ্য স্ববিরোধও সন্দিপনকালের আরেক বৈশিষ্ট্য বটে। সহজাত প্রতিভাবলে পাশ্চাত্যের ফাঁকি বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। তাই বেকনের এদেশীয় বংশধর রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-৯৪) মতো বিনা প্রশ্নে ইউরোপীয়দের সবকিছু মেনে নেন নি তিনি। 'সভ্যতার সংকটে' রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

> ভারতবাসী যে বুদ্ধিসামর্থ্যে কোনো অংশে জাপানের চেয়ে ন্যূন, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই দুই প্রাচ্য দেশের প্রধান প্রভেদ এই, ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত, আর জাপান এইরূপ কোনো পাশ্চাত্যজাতির পক্ষছায়ার আবরণ থেকে মুক্ত।[৩]

এ কারণে রবীন্দ্রনাথ মনে করছেন, "ভারতবর্ষ ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দল পাথর বুকে নিয়ে তলিয়ে পড়ে রইল নিরূপায় নিশ্চলতার মধ্যে।"[৪]

এক.

১৮৫২ সালে রচিত *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* নামে একটি গদ্য কাহিনী প্রকাশিত হয়।[৫] লেখক হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স নামের এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা। গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের জানাচ্ছেনঃ "লেখিকার একমাত্র উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকদের মনে এই ধর্ম গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপন। খৃষ্টধর্মের প্রভাবে মানুষের নৈতিক উন্নতি ও সদাচার-নিয়ন্ত্রিত, প্রলোভনজয়ী জীবনযাত্রা-নির্বাহের রুচিকর চিত্র অঙ্কিত করাই তাঁহার প্রধান কাম্য।"[৬] খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে গিয়ে লেখক যে গদ্য কাহিনী লিখলেন তা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "ধর্মান্ধ সঙ্কীর্ণতায় লেখিকার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। ফলে যা কিছু ভারতীয়ত্ব তার প্রতি লেখিকার চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতা।" প্রায় একই রকম প্রতিক্রিয়া পাচ্ছি আফ্রিকার সাহিত্যের আমরা (we) লেখক জয়েস ক্যারির *মিস্টার জনসন* সম্পর্কে। চিনুয়া আচেবে (জ. ১৯৩০) আমাদের জানাচ্ছেন, ইবাদান বিশ্ববিদ্যালয়ে এ গ্রন্থটি খুব গুরুত্ব দিয়ে

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

পড়ানো হলেও এতে তিনি আফ্রিকার জীবন ও সংস্কৃতি খুঁজে পান নি। ফলে এক ধরনের অতৃপ্তি থেকেই তাঁর *থিংস ফল এপার্ট* (১৯৫৮) রচনার প্রেরণা জাগে।[৭] খুব স্বাভাবিকভাবে বলা যেতে পারে কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) যখন কৃষ্ণনগরের মানুষদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ইতিবৃত্ত লিখতে শুরু করেন, তখন তিনি হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের মতো করে লিখেন না। তাঁর দেখার দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠে হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের আমরা (we) সভ্যতার পাল্টা জবাব (counter-discourse) হিসেবে।

দুই.

মিখাইল বাখতিনের (১৮৯৫-১৯৭৫) উপন্যাসতত্ত্বের আলোকে উপন্যাস হয়ে উঠেছে 'প্রত্যক্ষ বাস্তবতা'র শিল্প। সে হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামের *মৃত্যুক্ষুধা*কে (১৯৩০) প্রত্যক্ষ বাস্তবতার শিল্প বলা যেতে পারে। কারণ নজরুল এ উপন্যাস লেখার পূর্বে কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়ক এলাকায় চার বছর (১৯২৬-২৯) অবস্থান করেন। এ চার বছর কৃষ্ণনগর অবস্থানের অভিজ্ঞতা থেকে *মৃত্যুক্ষুধা*র সৃষ্টি।[৮] আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে এর ঘটনা-সংঘটনকাল এর রচনা কালের সমসাময়িক।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে কৃষ্ণনগর শহর সম্পর্কে একটি মন্তব্য দিয়ে। লেখক বলছেন, "পুতুল-খেলা কৃষ্ণনগর।"[৯] আরও এক জায়গায় নজরুল এ কথাটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, "সেই মাটির পুতুলের কৃষ্ণনগর।"[১০] একাধিকবার এ উচ্চারণ কি শুধু মৃৎশিল্পের কথা স্মরণ করার জন্যে না কি এখানে যে মানুষগুলো বাস করে তারা মাটির এক একটা জড়বৎ পুতুলের মতো যারা অদৃশ্য কোনো খেলোয়াড়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল বলে মনে করছেন লেখক? যদি সে রকম কোনো খেলোয়াড় থেকে থাকে তবে তারা কারা? এরা কি ঔপনিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ প্রভু?

হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্সের উপন্যাসে খ্রিস্টধর্মের যে জগৎ উন্মোচিত তাতে দেখা যায় ভারতবর্ষের সকল মঙ্গল-সুখ-শান্তি নিহিত খ্রিস্টধর্মের যথাযথ অনুশীলনের মধ্যে। ফুলমণি 'মনে-প্রাণে খৃষ্টধর্মানুসারী' হওয়ায় সুখি, পক্ষান্তরে করুণা খ্রিস্টধর্মে 'আন্তরিক ও আস্থাহীনা' হওয়ায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অসুখি। এ গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পৌনে একশ বছর পর নজরুলের চোখে ভারত উপনিবেশের খ্রিস্টধর্মের যে ছবি উন্মোচিত হয় তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের যে চিত্র নজরুল দেখেন তাতে 'একদিকে মৃত্যু, একদিকে ক্ষুধা'[১১]। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনে ক্ষুধা আর মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে ভারতবর্ষের মানুষগুলোর চেহারা কেমন হয়েছে নজরুল দেখাচ্ছেন,

> তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আর "ওমান কাতলি" (রোমান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশী কনভার্ট ক্রীশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়।
>
> এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু'চার ঘর আছে—চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মত। তবে তাদের আভিজাত্য-গৌরব ওখানকার মুসলমান-ক্রীশ্চান—কারুরই চাইতে কম নয়।
>
> একই-প্রভুর-পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে—এরাও যেন তেমনি।[১২]

লক্ষ করার বিষয়, ব্রিটিশ প্রভুদের পবিত্র ‘রোমান ক্যাথলিক’ ভারতবর্ষে এসে অপরিবর্তিত থাকছে না নজরুলকে সেটা বোঝাতে ব্র্যাকেট বন্দী করতে হচ্ছে রোমান ক্যাথলিকদের। এখানে নজরুল হিন্দুদের বলছেন ‘চানাচুর ভাজায় ঝালছিটের মত’ যারা ঐ এলাকার জন্য সংখ্যালঘু। কিন্তু মুসলমান খ্রিস্টানের পরস্পর অবস্থান হয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশ প্রভুর কুকুর বেড়ালের মতো। ব্রিটিশ প্রভুরা এমনি প্রভুভক্ত প্রাণী চেয়েছিলো। সেটা কুকুরই হোক আর বিড়ালই হোক। কুকুর (ব্রিটিশ ভারতীয় মুসলমান) প্রভুভক্ত হলেও ঘেউ ঘেউ করে প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না, তবে বিড়াল (খ্রিস্টান) আরামে থেকে জীবন কাটাতে চেষ্টা করে, প্রতিবাদ তেমন একটা নেই। উপন্যাসের পরবর্তী অংশে আমরা দেখবো এ বিড়ালরা কতটা আরামে জীবন কাটাতে সক্ষম হয়েছে।

সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত মত এই যে, উপন্যাসটি ভাবাবেগপূর্ণ এবং এর কাহিনী বিন্যাসে শৈথিল্য লক্ষ করা গেলেও বিষয় গৌরবে এ উপন্যাস অনন্য।[১৩] গজালের মায়ের পরিবারের ১০/১২ জন সদস্যের জীবন সংগ্রামের পরিণাম বিশ্লেষণে এর স্বরূপ ধরা পড়ে। এ উপন্যাসের একটি চরিত্র প্যাকালে। প্যাকালের পেশা বিচিত্র। সে ‘টাউনের থিয়েটার দলে নাচে, সখী সাজে, গান করে’। এ ছাড়া সে রাজমিস্ত্রির কাজও করে। একাধিক ‘আয়বর্ধক কাজে’ নিয়োজিত থেকে তাকে তার মৃত ভাইদের বিধবা স্ত্রীদের ও সন্তানদের নিয়ে গঠিত একটি বড় পরিবারকে লালন করতে হয়। সীমিত আয়ের মধ্য দিয়ে ‘দ্বাদশটি’ ‘ক্ষুধার তাড়না’ মিটাতে গিয়ে সে হিমশিম খায়। সংসারে অনেকদিন পর একটা বোয়াল মাছ এলে শিশুগুলো ‘যেন সাপের মাথায় মানিক’ দেখে। একটি বড় পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হিসেবে পরিবারটির মুখে শুধু দুমুঠো ভাত তুলে দিতে সংগ্রাম করতে হয় প্যাকালেকে।

জীবন সংগ্রামের মধ্যেও সে জড়িয়ে পড়ে কুর্শির সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে। কুর্শি ‘ওমান কাতলি’ পরিবারের সদস্য। খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে তার পরিবার যে খুব সুখে আছে এমন নয়। প্যাকালে লক্ষ করে: “ঘরে কাঁদে মেজ-বৌ, বাইরে কাঁদে কুর্শি। একজন ঘৃণায়, রাগে— আর একজন অভিমানে, বেদনায় অসহায় পীড়নে।”[১৪] একদিকে পরিবারের প্রতি দায়িত্ববোধ অন্য দিকে কুর্শির ভালোবাসা দুয়ের দ্বন্দ্বে পড়ে বিভ্রান্ত ‘থিয়েটার দলের সদস্য’ প্যাকালে পালায়। বরিশালে গিয়ে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে পিয়নের চাকরি পায় সে। কুর্শিকে নিয়ে শুরু করে নতুন জীবন। কুর্শির সৌন্দর্য বর্ণনায় নজরুল আয়রনি করেন অনেকটা। কুর্শির বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে প্যাকালে গান ধরে “কালো শশীরে, বিরহ-জ্বালায় মরি!”[১৫] আর নজরুলের ভাষায় সে, ‘কালোকুলো গোলগাল মেয়ে’[১৬]। কুর্শি কালো কেন? কালো এশীয়দের যিশু কীভাবে সাদা ইউরোপীয়দের প্রভু হয়ে উঠেছে সেটা গবেষণার বিষয় হলেও নজরুল খ্রিস্টান কুর্শির গায়ের রং কালো বলে কঠিন আয়রনি ছুড়ে দেন এটা বলা যায়। ফুলমণির মতো খ্রিশ্চিয়ানি তার পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা যেমন দেয় না, তেমনি খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণের ফলে তার সাদাত্ব নিশ্চিত হয় না। জীবন যুদ্ধে পরাজিত প্যাকালের নিরুদ্দেশ হওয়ার পর মেঝ-বৌ ভাবে: “পুরুষ যেখানে হার মেনে পালিয়ে গেল, সেই খানে দাঁড়িয়ে সে যুদ্ধ করবে, তবুও পিছু হটবে না।”[১৭] মেঝ-বৌ নজরুলের সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার মানস ফসল। ফলে তার কথা-বার্তা আচরণে

প্রকাশিত হয় নজরুলের মনোভাব। গুন গুন করে গান করার জন্য শাশুড়ি 'আল্লা ব্যাজার' হওয়ার ভয় দেখালে সে বলে, "আমি খুশি হলে তিনি (আল্লাহ) কি খুশি হন না?"[১৮] বঙ্কিমচন্দ্রের হীরা ছিলো বাল্যবিধবা তবুও সে বিধবার বেশ নেয় নি। এটা ছিলো মহাদোষের ব্যাপার। নজরুলের মেঝ-বৌও বিধবা, "তবু পান ত খায়ই, দু-একদিন চুড়িও পরে— রঙিন রেশমি চুড়ি।"[১৯]

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৪৭-১৯১৯) *কঙ্কাবতী* (১৮৯২) উপন্যাসের কঙ্কা জ্বরের ঘোরে মশাদের জগতে প্রবেশ করলে তার পরিচয় সম্পর্কে মশার প্রশ্নের জবাবে সে বলে, "মহাশয়! পূর্ব্বে আমি পিতার সম্পত্তি ছিলাম। বাল্যকালে মনুষ্য বালিকারা পিতার সম্পত্তি থাকে। দানবিক্রয়ের অধিকার পিতার থাকে। অন্ধ, আতুর, বৃদ্ধ ব্যাধিগ্রস্ত— যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই তিনি দান করিতে পারেন। ...আমার পিতা, তিন সহস্র স্বর্ণমুদ্রা লইয়া, আমাকে আমার পতির নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। এক্ষণে আমি পতির সম্পত্তি।"[২০] মেজ-বৌয়ের ক্ষেত্রে এ সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠেছে। বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পিতৃ-পরিবারে তার জায়গা নেই স্বামী না থাকায় শ্বশুরের পরিবারে সে পাড়ার সকল পুরুষের আগ্রহের বস্তু। নজরুল অন্তত তিনবার তার নামের প্রসঙ্গে আত্ম-পরিচয়ের সঙ্কটটি তুলে ধরেছেন। পুরো উপন্যাসে মেজ-বৌয়ের পিতৃদত্ত নামটি পাওয়া যায় না। মেজ-বৌয়ের নিজের ভাষায়: "নাম একটা ছিল হয়ত, তা এখন ভুলে গিয়েছি। এখন আমি 'মেজ-বৌ'।"[২১] গজালের মায়ের পরিবারে মেজ-ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় পিতৃদত্ত নামটি সে হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় সে একটি নতুন নাম পেয়েছে হেলেন। তার শারীরিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানিয়ে যায় এ নাম কিন্তু এতে সে হারিয়ে ফেলে অস্তিত্ব। তাই এ নামটিও বেশি চলে না। ঘুরে ফিরে চলে মেজ-বৌ পরিচয়টিই। বরিশালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী অন্য এক নারীর প্রশ্নের জবাবে সে বলে, "তালগাছ না থাকলেও তালপুকুর নামটা কি বদলে যায়?"[২২] মেজ-বৌ বিধবা সুতরাং পিতৃ-পরিচয় তার নেই, নেই স্বামীর পরিচয়ও। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার শারীরিক সৌন্দর্য। লেখকের ভাষায়: 'মেজ-বৌয়ের রূপ পাড়ার নিত্যকার আলোচনার বস্তু'।[২৩] স্বাভাবিকভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ সৌন্দর্য তার জন্য বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। সেজ-বৌয়ের চিকিৎসা করতে আসা ন'কড়ি ডাক্তার চিকিৎসা ছেড়ে এমনভাবে মেজ-বৌয়ের দিকে তাকায় যেন, 'গিলে খাবে'। শাশুড়ি বলে, 'আগুনের খাপরা'। এ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ভগ্নিপতি ঘিয়াসুদ্দীন তাকে প্রলুব্ধ করে। কিন্তু মেঝ-বৌ জানে, "পুরুষগুলো যেন আমাদের হাতের-গলার চুড়ি। ভাঙতেও যতক্ষণ গড়তেও ততক্ষণ।"[২৪]
মেঝ-বৌয়ের চারিত্রিক দৃঢ়তা শেষ পর্যন্ত টিকে না। প্যাকালের অনুপস্থিতিতে নিদারুণ দারিদ্র্যে পরিবারটি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। সে সঙ্গে মেঝবৌও। অসুস্থ অবস্থায় সে বলে, "শুকিয়ে মরলেও কেউ শুধোয় না এসে। ঝ্যাঁটা মার নিজের জাতের মুখে, গেঁয়াত কুটুম্বের মুখে। সাধে কি আর সব খেরেস্তান হয়ে যায়।"[২৫] এ সময় এগিয়ে আসে খ্রিস্টান মিশনারিরা। তাদের দেওয়া ঔষধ ও পথ্যে সে সুস্থ্য হয়। বাঁচার প্রয়োজনে সে 'খেরেস্তান' পাড়ায় গেলে 'ঝড়, বজ্র ও শিলাবৃষ্টির মতই বেগে চিৎকার, কান্না, গালি চলতে লাগল।' এ কারণে খ্রিস্টান হয়ে যাওয়ার পর আনসার যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করে তখন সে বলে, "আপনারা একটু একটু করে আমায় খ্রিস্টান করেছেন।"[২৬] মেঝ-বৌ 'আপনারা' বলতে

গোটা মুসলমান সমাজব্যবস্থাকে বুঝিয়েছে। যে সমাজ তার বৈধব্যকে কটাক্ষ করে সে সমাজ তার ও তার সন্তানের ক্ষুধার সমাধান দেয় না। উপরন্তু নিজে ব্যবস্থা করতে গেলে বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়। আনসার তাই বলে, "আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশি অত্যাচার করে আপনার মত মেয়েকেও খ্রিস্টান হতে বাধ্য করেছে!"[২৭] খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর মেঝ-বৌ স্বাভাবিক স্বাধীনতা টুকুও হারায়। তার ভাগ্য নির্ধারিত হয় পাদরিদের সিদ্ধান্তে। মেঝ-বৌ বলে, "আমার যা করবার তা ত এখন ঠিক করে দেবে ঐ সাহেব-মেমগুলোই। তারা আমায় কালই বোধ হয় বরিশাল বদলি করে দেবে।"[২৮] মিশনারিরা তা-ই করে। এ উপন্যাসে নজরুল দেখিয়েছেন ভারতবর্ষের জনগোষ্ঠীর একটি অংশ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। তবে ধর্মান্তরিত হওয়ার কারণ মহৎ ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্বলতা নয়। বরং বস্তি জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা আর ক্ষুধায় কাতর এদেশের দরিদ্র নিম্নবর্গের মানুষগুলো শুধু পাদরিদের প্রচারিত উন্নত জীবনের আশায় ধর্ম গ্রহণ করেছে। এরা সময়ে অসময়ে খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষার কথা বলে মানুষকে প্রলুব্ধ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেয়। শুধু খেয়ে পরে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ ধর্মান্তরিত হচ্ছে। মেজ-বৌয়ের পরিণতি ভেবে বড়-বৌয়ের ভাবনা: "কত বড় দুঃখে পড়ে মেজ-বৌ আজ মিস্-বাবাদের কাছে সরে যাচ্ছে, তা-ও তার অজানা ছিল না। তাই আঁচলের খুঁটে চোখের জল মুছে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।"[২৯] যদিও এর মধ্য দিয়ে মেঝ-বৌদের বিসর্জন দিতে হয়েছে ব্যক্তিত্ববোধ, আপন সংস্কৃতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। যেটা ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক শাসনের ফলে সৃষ্ট এক নির্মম নিয়তি।

গোটা ভারতবর্ষে না হোক বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় শতবর্ষ পর হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স *ফুলমণি ও করুণার বিবরণ* লিখে ভারতবাসীকে বোঝাতে চেয়েছেন খ্রিস্টধর্মের মাহাত্ম্য যা সর্ব শোক-দুঃখ হরণ করে শান্তি আনতে পারে ভারতবর্ষে। আর নজরুল তারও প্রায় ৭৫ বছর পর ঔপনিবেশিক শাসনের নতুন রূপ তুলে ধরলেন। দেখালেন বস্তি-জীবনের নিষ্ঠুর বাস্তবতা আর এদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে 'মিস্-বাবাদের' খ্রিস্টধর্মে প্রলুব্ধ করার এক নতুন গল্প।

তথ্যসূচি:

---

১ স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬) 'জ্ঞানই শক্তি' বক্তব্যটিকে সামনে নিয়ে এসে প্রথম ইংরেজ লেখক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন যিনি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিকে ব্যবহার করে বিশ্বের সম্পদ লুণ্ঠনের সাম্রাজ্যবাদী ধারণা তুলে ধরেন। Fakrul Alam, *Imperial Entanglements and Literature in English*, (Dhaka: Writers.ink, ২০০৭), p. ১৩. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বেকনের এসব অভিযাত্রী মানুষদের বলেছেন 'বেকনের মৌমাছি। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, 'বেকনের মৌমাছিরা' *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৫৪-১৬৬

[২] অপরতাবোধের (otherness) ধারণাটি এসেছে উপনিবেশের মানুষ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঔপনিবেশিক প্রভু ও তাদের তাত্ত্বিক বুদ্ধিজীবীদের আলোচনা প্রসঙ্গে। এডওয়ার্ড সাঈদ *Orientalism* (১৯৭৮) গ্রন্থে এ প্রত্যয়টি ব্যাপক ব্যবহার করেছেন। সাঈদের প্রাচ্যবাদের ধারণাটিতে প্রতীচ্য কর্তৃক প্রাচ্যকে নির্মাণের প্রসঙ্গটি এসেছে। প্রাচ্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা মানসিকভাবে ঔপনিবেশিক। ফলে তাঁরা প্রাচ্যকে উপস্থাপন করেছেন পশ্চাদপদ ও অলস হিসেবে; প্রাচ্যের মানুষেরা ঠিক মানুষ নয়। এরা নিজেদের তুলে ধরতে অক্ষম। এক্ষেত্রে প্রতীচ্যের মনীষীগণ নিজেদের আমরা (we) এবং প্রাচ্যকে তারা (they) হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ফলে প্রতীচ্যের অপর (other) হিসেবে নির্মিত হয়েছে প্রাচ্য। প্রতীচ্যের এ মনোভাবে প্রাচ্যের প্রকৃতরূপ কীভাবে হারিয়ে গেছে তা-ই দেখিয়েছেন সাঈদ। Edward W. Said, *Orientalism* (1^{st} India edn.; New Delhi: Penguin Books India, ২০০১). অপরতাবোধ ধারণাটি বর্তমানে সাহিত্যালোচনা রীতিতে বেশ গুরুত্ব সহকারে ব্যবহৃত হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভুর অপর হিসেবে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের অপর হিসেবে নারী এবং ভারতবর্ষের বর্ণ বিভক্ত সমাজে উচ্চবর্ণের অপর হিসেবে নিম্নবর্ণ নির্মিত হয়

[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সভ্যতার সংকট' *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ষড়বিংশ খণ্ড, (কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ) পৃ. ৬৩৯

[৪] *তদেব*, পৃ. ৬৩৮

[৫] এ গ্রন্থ সম্পর্কে তথ্যগুলো উদ্ধার করা হয়েছে দ্বৈতীয়িক উৎস থেকে। যে দুটো গ্রন্থ থেকে তথ্য নিয়েছি সেগুলো হলো: ১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* (পুনর্মুদ্রণ; কলকাতা: মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৬)। ২. সরোজ বন্দ্যোপধ্যায়, *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর* (৪র্থ সং; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০০)

[৬]. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা*, পৃ. ২৫

চিনুয়া আচেবে, 'সাক্ষাৎকার' *আফ্রিকার সাহিত্য সংগ্রহ*-২, শিবনারায়ণ রায় ও শামীম রেজা (সম্পা.), (ঢাকা: কাগজ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ৬৮

স্বপ্না রায়, 'নজরুল ইসলামের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস', *নজরুল বীক্ষণ*, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.) (ঢাকা: নজরুল গবেষণা কেন্দ্র, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৪৭

[৯] কাজী নজরুল ইসলাম, 'মৃত্যুক্ষুধা', *শ্রেষ্ঠ নজরুল* আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.) (ঢাকা: অবসর, ১৯৯৬), পৃ. ৩৬৭

[১০] *তদেব*, পৃ. ৪১৮

[১১] *তদেব* , পৃ. ৩৯৩

[১২] *তদেব*, পৃ. ৩৬৭

[১৩] স্বপ্না রায়, 'নজরুল ইসলামের *মৃত্যুক্ষুধা* উপন্যাস', পৃ. ১৪৭ ও ১৫১

[১৪] কাজী নজরুল ইসলাম, 'মৃত্যুক্ষুধা', পৃ

[১৫] *তদেব*, 'মৃত্যুক্ষুধা', পৃ. ৩৭৩

[১৬] *তদেব*, 'মৃত্যুক্ষুধা', পৃ.৩৭৩

[১৭] *তদেব*

[১৮] *তদেব*, পৃ. ৩৯১

[১৯] *তদেব*, পৃ. ৩৮২

[২০] ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়,'কঙ্কাবতী', *ত্রৈলোক্যনাথ রচনাসংগ্রহ*, আনিসুজ্জামান সম্পা. (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৯৭

[২১] কাজী নজরুল ইসলাম, 'মৃত্যুক্ষুধা', পৃ. ৩৯৮

[২২] *তদেব*, পৃ. ৪২৫

[২৩] *তদেব*, পৃ. ৩৭৯

[২৪] *তদেব*, পৃ. ৩৮৪

[২৫] তদেব, পৃ. ৫৭৪
[২৬] তদেব, পৃ. ৪১০
[২৭] তদেব, পৃ. ৪১১
[২৮] তদেব, পৃ. ৪১৩
[২৯] তদেব, পৃ. পৃ.৩৯৭